দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 07 MAR 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

সম্পাদকীয়

ঝরিয়া পড়া রোধে আরও মনোযোগী হইতে হইবে

জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যটি হইল ২০১৫ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল দুইটি। প্রথমত, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ শিশুর ভর্তি নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, ঝরিয়া পড়ার হার শূন্যে নামাইয়া আনা। প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের সমতাভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করিবার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য দেখাইয়াছে। সরকারের ২০১২ সালের এমডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেয়ে ও ছেলে শিশুদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল যথাক্রমে ৯৯ দশমিক ৪ এবং ৯৭ দশমিক ২ শতাংশ। এমনকি মাধ্যমিক পর্যায়েও মেয়েরা ছেলেদের সাথে সমানতালে পা ফেলিয়া আগাইয়া যাইতেছে। কিন্তু সরকারের নানা উদ্যোগ সত্ত্বেও ঝরিয়া পড়ার হার আশানুরূপভাবে কমিতেছে না। ফলে বিষয়টি এখনও গুরুতর উদ্বেগের কারণ হিসাবে বিবেচিত হইতেছে।

প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে ভর্তি হইলেও তাহাদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ যে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পৌঁছাইবার আগেই ঝরিয়া পড়িতেছে তাহা লইয়া সংশয় নাই; যদিও তাহাদের সংখ্যা কতো তাহার সঠিক তথ্য সন্ধান করিতে গিয়া গবেষকরাও হতাশ হইয়াছেন। তবে যেই প্রশ্নটি সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষভাবে ভাবাইয়া তুলিয়াছে তাহা হইল: কী কারণে তাহারা ঝরিয়া পড়িতেছে। ঝরিয়া পড়া রোধ করিবার উপায়ইবা কী? প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, পিপিআরসি ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনেও বিষয়টির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে। ছয় ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৭৮ লক্ষ শিক্ষার্থীর উপর পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে প্রকাশিত 'বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় বৃত্তি: একটি গুণগত মূল্যায়ন' শীর্ষক এই প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে যে, ঝরিয়া পড়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হইল, শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে অপারগতা। বিশেষ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হইলেও চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি পর্যায়ে একজন শিক্ষার্থীর জন্য যে অর্থ ব্যয় করিতে হয় বেশিরভাগ দরিদ্র পরিবারের পক্ষে তাহা সাধ্যাতীত। প্রসঙ্গত প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের প্রদত্ত ছাত্রবৃত্তির অবদানকে বহুমাত্রিক আখ্যায়িত করিয়া প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে যে, ভর্তি ও স্কুলে উপস্থিতির ক্ষেত্রে শুধু নহে, ঝরিয়া পড়া রোধেও ইহার যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। তাৎপর্যপূর্ণ এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ঝরিয়া পড়া রোধকল্পে ছাত্রবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হইয়াছে উক্ত প্রতিবেদনে। উল্লেখ্য যে, বৃত্তি কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর একদশক পার হইলেও ভাতার পরিমাণ ১০০ টাকাই রহিয়া গিয়াছে। আবার প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বরাদ্দও সমান। বলা বাহুল্য, সূচনালগ্নে বৃত্তি হিসাবে প্রদত্ত এই অর্থের যে মূল্যমান ছিল ইতোমধ্যে তাহা অর্ধেকে নামিয়া আসিয়াছে। অন্যদিকে, শিক্ষার ব্যয় বাড়িয়াই চলিয়াছে। অতএব, সরকারের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিষয়টি গুরুত্বের সহিত বিবেচনার দাবি রাখে।

পাশাপাশি শুধু অর্থাভাব বা অর্থনৈতিক অপারগতাই যে ঝরিয়া পড়ার একমাত্র কারণ নহে— তাহাও বলার অপেক্ষা রাখে না। জীবিকার প্রয়োজনে স্কুলবয়সী শিশুদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশকে যে কৃষি, গৃহকর্ম কিংবা উপার্জনমূলক নানা কাজে জড়াইয়া পড়িতে হয় তাহা সত্য। তবে এই অজুহাতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ায় যে গুরুতর গলদ রহিয়া গিয়াছে তাহাও অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা যাইবে না। তালিকাটি অনেক দীর্ঘ। তন্মধ্যে শিশুবান্ধব নয় এমন শিক্ষণ পদ্ধতি, অনাকর্ষণীয় ও অস্বাস্থ্যকর শিক্ষার পরিবেশ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতএব, কার্যকরভাবে ঝরিয়া পড়া রোধ করিতে হইলে এইসব দিকেও যথাযথ মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে হইবে। গ্রহণ করিতে হইবে দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা।